দেশভাগ ঃ অন্তহীন আত্মলাঞ্ছনার ক্ষত

গৌতম সান্যাল

অখণ্ড বঙ্গভূমির অখণ্ডিত বাঙালি জাতিসত্তার জাতীয় শোকপালনের দিন হ'ল ১৫ আগস্ট ১৯৪৭। গভীর তপস্যা, কঠিন আত্মত্যাগ আর অবিরাম রক্তক্ষরণের বিনিময়ে বাঙালি সেদিন পেয়েছিল খণ্ডিত আকাশ, দ্বিখণ্ডিত স্বাধীনতা। বলা যায় সমগ্র বাঙালির জীবনে সর্বাপ্রেক্ষা ট্রাজিক মুহূর্তটি ইতিহাসে মুদ্রিত হয়ে গেল এই দ্বিখণ্ডিত স্বাধীনতার হাত ধরে। ঘটনার আকস্মিকতায় স্তব্ধ, মৌন বাঙালি বুকে পাথর চাপা দিয়ে দেখেছিল—

সীমানার দাগে দাগে জমাট রক্তের দাগ
কালনেমী করে লঙ্কাভাগ (পনেরই আগস্ট, দিনেশ দাস)

কিন্তু কেন? কেন বাঙালি পেয়েছিল এই খণ্ডিত স্বাধীনতা, কেন সন্দেহ আর অবিশ্বাসের আগুনে পারস্পরিক দাঙ্গায় জড়িয়ে পড়েছিল বাঙালি? কেন তাকে উদ্বাস্তু হতে হল? কেন তাকে শিকড় ছিঁড়ে ছড়িয়ে পড়তে হল পি. এল. ক্যাম্প থেকে মরিচ ঝাঁপি, দণ্ডকারণ্য, আন্দামানের দূরতম দুর্গম প্রান্তে? ঘটনাটা ঘটেছিল সেই চল্লিশের দশকে। কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে রয়েছে বিগত ৭ দশকের ইতিহাস জুড়ে বয়ে চলা বাঙালির জনজীবনে। দেশভাগ কেন হল এ নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা, বিশ্লেষণ কম হয় নি। একটা জাতির এই ধ্বংসের দায়ভার আমরা কাকে দেব সে ইতিবৃত্তটি জানা উত্তরপ্রজন্মের কাছে জরুরি তবে তার থেকেও জরুরি এ ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় বাঙালির উত্তর প্রজন্মের মধ্যে আর্থ-সামাজিক জীবন ও মূল্যবোধের কোন পরিবর্তন এসেছিল তা বিশ্লেষণ করা। বিষয়টির মধ্যে নতুনত্ব না থাকলেও যে কোনো ফিরে দেখাই মানুষকে তাঁর বর্তমান অবস্থানকে বুঝে নিতে সাহায্য করে। এ জাতীয় ফিরে দেখা মানুষকে সচেতন করে তোলে। তাই দেশভাগের স্মৃতি শ্রুতি বা ইতিহাস বারবার বাঙালির আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে আসে।

বাংলা ভাগের প্রসঙ্গে অনিবার্যভাবেই জড়িয়ে যায় সমগ্র দেশভাগের প্রসঙ্গ। ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট শুধু বাংলা ভাগই হয়নি, অখণ্ড ভারতভূমিও সেদিন দু-টুকরো হয়ে গিয়েছিল। এই দ্বিখণ্ডিত স্বাধীনতার বীজতলা তৈরি হয়েছিল বহু আগে। মুসলিম শাসনের শেষে ব্রিটিশ শাসনকালে শিক্ষিত মুসলিমদের মনে এক ধরনের হীনম্মন্যতার জন্ম হয়েছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষা সংস্কৃতিকে দ্রুত গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে দুশো বছরের ব্রিটিশ শাসনকালে হিন্দুরা যে

পরিমাণে সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্তরে নেতৃত্বের ভূমিকায় উঠে আসে পাশ্চাত্য শিক্ষাকে ধর্মীয় কারণেই উপেক্ষা করায় মুসলিমরা সেই পরিমাণেই সামাজিক বা প্রাতিষ্ঠানিক অগ্রগতিতে পিছিয়ে পড়েছিল। হিন্দুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এই পিছিয়ে পড়ার কারণে শিক্ষিত মুসলমানের মধ্যে হিন্দুদের প্রতি একটি সচেতন অভিমান তৈরি হচ্ছিল। তারা চাইছিল স্বতন্ত্র অস্তিত্ব, স্বতন্ত্র জাতি সত্তা, স্বতন্ত্র বাসভূমি। তাই যখন মোহম্মদ আলী জিন্নাহ মুসলমানদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংঘবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে পথে নেমেছেন ঠিক তখন ১৯৩০-এর ২৯ ডিসেম্বর কবি ও রাজনীতিবিদ আল্লামা ইকবাল মুসলমানদের জন্য পৃথক আবাসভূমি দাবি করে বসলেন। কোরাণভিত্তিক মুসলিম আবাসভূমি'র পরিকল্পনা ছড়িয়ে দিলেন মুসলিম জনগণের অন্দরমহলে। দ্বিজাতিতত্ত্বের অন্যতম প্রবক্তা জিন্নাহ্ সাহেব কিন্তু প্রথম দিকে লীগপন্থী ছিলেন না। লণ্ডনে গিয়ে তাঁকে লীগের প্রতি অনুরক্ত করে তোলেন নবাবজাদা লিয়াকত আলি খান। ইকবাল পরিকল্পিত মুসলিম লিগের ভাবনায় ভাবিত হতে শুরু করলেন তিনি। একদা মুসলিম ধর্মশাস্ত্রে প্রায় অজ্ঞ জিন্নাহ সাহেব শুধু ধর্মপ্রাণ ও মুসলিম ধর্মশাস্ত্রে পণ্ডিতই হয়ে উঠলেন না, তিনি দেশে ফিরে এসে প্রতিটি মুসলমানের কানে পৌঁছে দিলেন কোরানে বর্ণিত দ্বিজাতিতত্ত্বের বার্তা এবং এই ধ্বংসাত্মক তত্ত্বকে ভিত্তি করেই ১৯৪০-এর ২৩ মার্চ মুসলিম লীগ ভারত বিভাজন দাবি করে বসল। দাবি তখন সবে মাত্র অঙ্কুরিত হচ্ছে। তবু মহাত্মা গান্ধী দেশভাগের এই ভাবনা যে ভয়ঙ্কর বিপদজনক ভাবনা তা অনুভব করেন। তাঁর মতে ভারতবর্ষের মুসলমানেরা যদি নিজেদের একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে মনে করে এবং তার ভিত্তিতেই দেশটা ভাগ করতে চান তবে এই দেশ অনিবার্যভাবেই বিভক্ত হবে একদিন। হিন্দুরা বাধা দিতে গেলে ইংরেজের বদলে মুসলিমদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ লড়াই বাঁধবে এবং এর ফলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রাপ্তির সম্ভাবনাও ক্ষীণ হয়ে আসবে। 'হরিজন' পত্রিকায় তিনি লেখেন—

> Whether those who believe in the two nation theory and Comunal partition of India can live as friend cooperting with one another I do not know. If the vast majority of Muslims regard themselves as a separate nation having nothing in common with Hindus and others, no power on earth can compel them to think Otherwise. And if they want to partition India on that basis, they must have the partition. (13.4.1942)

এই সত্যটি অনুভব করলেও ১৯৪২-এর পরবর্তী দিনগুলিতে দেশভাগ সম্পর্কে বারবার অবস্থান বদল করেছেন তিনি। ১৯৪০-এ মুসলিম লিগের সাম্প্রদায়িক রাজনীতি এবং দেশবিভাগ সম্পর্কে তিনি যে কঠোর অবস্থান নিয়েছিলেন ১৯৪৪-এ তা অনেকটাই নমনীয় হয়ে পড়ে। আবার ৪৭-এর ৩১ মার্চ তিনিই ঘোষণা করেন ভারতবর্ষকে ভাগ করতে হলে তাঁর মৃতদেহের উপর দিয়ে হেঁটে গিয়েই সে কাজ করতে হবে। পরিস্থিতির চাপে দেশভাগ সম্পর্কে গান্ধিজীর মধ্যে যে দ্বিধা বা দোলাচলতা ছিল সে বিষয়ে ঐতিহাসিকেরা একমত। তাঁর এই দোলাচলতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল জাতীয় নেতৃবৃন্দের এ সমস্যার আশু

সমাধানের আকাঙ্ক্ষা। আবার জাতীয় নেতৃবৃন্দের এই ক্লান্তির সুযোগে মহম্মদ আলি জিন্নার নেতৃত্বে মুসলিম লিগ দেশভাগের দাবিতে ক্রমশই আন্দোলনকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পথে নিয়ে চলেছিল। ব্রিটিশ সরকারও চাইছিল কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ উভয় দলের মিলিত সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে। এই উদ্দেশ্যে সংবিধান সভা ও অন্তবর্তী সরকার গঠনের চেষ্টাও করে তারা। কিন্তু মুসলিম লিগ সংবিধান সভা বয়কট করে অন্যদিকে নিজেদের দাবি আদায়ের জন্য অন্তবর্তী সরকারেও যোগ দিতে অস্বীকার করে। অবশেষে লর্ড ওয়াভেলের আন্তরিক চেষ্টায় ১৯৪৬-এর ২৫ অক্টোবর মুসলিম লিগের পাঁচজন সদস্য অন্তবর্তী সরকারে যোগ দিয়ে ন্যাশনাল কোয়ালিশন সরকার গঠন করলেও সংবিধান সভা বয়কট করল। পরিবর্তে পাকিস্তানের জন্য একটি স্বতন্ত্র সংবিধান প্রস্তুত করবার দাবিতে সোচ্চার হল। সংখ্যাগত দিক থেকে সংখ্যালঘু মুসলিমরা বুঝতে পেরেছিল গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তাদের দাবি আদায় সম্ভব নয়। ১৯৪৬-এ মুসলিম অধ্যুষিত পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশে নির্বাচনে হেরে গিয়ে মুসলিম লিগ নেতৃত্ব বুঝেছিল গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কংগ্রসের সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার গড়লে তাদের পাকিস্তান রাষ্ট্রের দাবি কোনোদিনই আদায় হবে না। তাই ১৯৪৬-এর ১৬ ই আগস্ট মুসলিম লিগ প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দেয়। ২৯ জুলাই ১৯৪৬-এ বোম্বেতে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় মুসলিম লিগের সভায় এই সিদ্ধান্ত নিলেন তারা। রমজান মাসের ১৬ তারিখে শুক্রবারকে তারা বেছে নিলেন মুক্তিদিবস হিসাবে। ১৬ই আগস্ট কলকাতায় ময়দানে ডাকা মুসলিম লিগের সভা থেকেই শুরু হয়ে গেল দাঙ্গা। এই দাঙ্গা ইতিহাসের পাতায় 'দি গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং' নামে কলঙ্ক রেখা হয়ে আছে। তিনদিন ধরে চলে নারকীয় হত্যাকাণ্ড। মিঃ জিন্নার নির্দেশ কলকাতায় সোহারাওয়ার্দি পুলিশ ও প্রশাসনকে নিষ্ক্রিয় রেখে এই হত্যাকাণ্ড চালালেন। ক্রমে এ দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে নোয়াখালিসহ সমস্ত পূর্ববঙ্গ ও অন্যান্য প্রদেশেও। বস্তুতপক্ষে এই হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে ভারতবাসীর আশা স্বপ্ন, মানচিত্র ও তার ইতিহাসও অনেকটা বদলে গেল। 'The Last Days of the British Raj' গ্রন্থে লিওনার্ড মোসেল এই দাঙ্গার প্রতিক্রিয়া ও তার স্বরূপ সম্পর্কে এ কথাই আমাদের জানিয়েছেন—

> ১৯৪৬ সালের আগস্ট মাসের ঐ কুৎসিত ও ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞ কলিকাতাকে যে ৭২ ঘন্টার জন্য অস্থিময় কবরখানায় পরিণত করিয়াছিল উহা গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, উহা নিষ্পাপ মানুষকে হত্যা করা ছাড়াও বেশি কিছু করিয়াছে। উহা মানুষের আশাও হত্যা করিয়াছে। উহা ভারতের আকৃতি ও ইতিহাসের গতি বদল করিয়া দিয়াছে।

এ ঘটনার পরও জাতীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব ভারতভাগ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারছেন না দেখে মুসলিম লীগ চরম আঘাত হানল ১৯৪৬-এর ১০ অক্টোবর সেদিন ছিল লক্ষ্মীপুজোর দিন, বৃহস্পতিবার। মুসলিম লীগের প্রশিক্ষিত বাহিনী 'মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড' এবং কয়েক হাজার গুণ্ডা হিন্দু-নিধন যজ্ঞ চালায় নোয়াখালি, কুমিল্লার রামগঞ্জ, বেগমপুর, লক্ষ্মীপুর, রাইপুর, প্রভৃতি অঞ্চলে। হত্যা লুঠ, গণধর্ষণ, অপহরণ,

অগ্নিসংযোগ, ধর্মান্তরকরণ কোনো কিছুই বাদ গেল না। আতঙ্কিত মানুষ যাতে পালাতে না পারে তার জন্য জলপথ, স্থলপথ বন্ধ করে দেওয়া হয়। অন্যদিকে পুলিশ ও প্রশাসন সম্পূর্ণ নিশ্চুপ থাকে। বঙ্গীয় প্রদেশ কংগ্রেসের সে সময়ের সভাপতি সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ ঐ দুই জেলার দাঙ্গা সম্পর্কে লেখেন—

> দাঙ্গা বিধ্বস্ত নোয়াখালি জেলায় একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য শাসন ব্যবস্থা কিছুই ছিল না।... ১০ই অক্টোবরের পর থেকে কেবলমাত্র নোয়াখালি ও ত্রিপুরার কয়েকটি অঞ্চলে ৫০০০-এরও বেশি লোককে হত্যা করা হয়েছে। ৫০,০০০-এরও বেশি নরনারীর উপর চলেছে দাঙ্গা, ধর্মান্তকরণ, নারীর পুনর্বিবাহ এবং ধর্ষণ। (দ্বিজাতিতত্ত্ব ও বাঙালী— বিনয়ভূষণ ঘোষ)

এই দাঙ্গাই সংক্রামিত হয়ে যায় লাহোর, মূলতান, রাওয়াল পিণ্ডি, অমৃতসর ও গুরুদাসপুরে। এই ভয়ঙ্কর দাঙ্গা যেমন দুটি বৃহৎ ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস, সন্দেহ আর অসহিষ্ণুতা বাড়িয়ে দেয় তেমনি সাধারণ মানুষও বুঝতে শুরু করে দেশভাগ হওয়া ছাড়া এই সমস্যার কোনো সমাধান নেই। এই উত্তেজনাকর মুহূর্তে লর্ড মাউন্টব্যাটেন সুকৌশলে বল্লভভাই প্যাটেল এবং জওহরলাল নেহেরুকে প্রভাবিত করে দেশভাগের পক্ষে তাঁদের সম্মতি আদায় করে নিলেন। ২রা জুন ১৯৪৭-এ বিভিন্ন দলীয় জাতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তিনি আলোচনায় বসলেন। এই সম্মেলনে কংগ্রেসের পক্ষে ছিলেন জওহরলাল নেহেরু, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল এবং আচার্য জে. বি. কৃপালনি, মুসলিম লীগের পক্ষে ছিলেন মহম্মদ আলি জিন্না, আবদুরবর নিশতার এবং লিয়াকত আলি খান ও শিখ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসাবে ছিলেন বলদেব সিংহ। সম্মেলনে সর্বসম্মতভাবে মাউন্টব্যাটেন দেশভাগ অনুমোদন করে নিলেন। ৩রা জুন সন্ধ্যায় বেতারের মাধ্যমে লর্ড মাউন্টব্যাটেন দেশবাসীকে এই দ্বিখণ্ডিত স্বাধীনতা দানের কথা ঘোষণা করেন। ১৯৪৭-এর ৪ঠা জুলাই ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারতের স্বাধীনতা আইন বিধিবদ্ধ হয়। অবশেষে রাজকীয় সম্মতি পেল ১৮ই জুলাই রাজা ষষ্ঠ জর্জের এই আইনে স্বাক্ষর দানের মধ্য দিয়ে। ১৫ ই আগস্ট ক্ষমতা হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কংগ্রেসি নেতৃবৃন্দের দোলাচলতা, মুসলিম লীগের দাবি, ক্রমবর্ধমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, লর্ড মাউন্টব্যাটনের কূটনৈতিক চালের সামনে অসহায়ভাবে নীরব হয়ে রইলেন মহাত্মা গান্ধীও। ফলে দেশভাগ হল। সেই সঙ্গে মাউন্টব্যাটনের পরিকল্পনায় পাঞ্জাব ও বাংলা ভাগের নির্দেশও ছিল। ৬ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা ছিল—

> The members of the two parts of each Legislative Assembly siting seperately will be empowered to vote wheathers or not the province Should be partitioned, If a simple mejority of either part decides in favour of partition, division will place and arrangement will be made accordingly (British Government Statement of 3rd june, — মৌলনা আবুল কালাম আজাদের India wins Freedom গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত)

নির্দেশটি আরো স্পষ্টভাষায় উল্লেখিত হয়েছিল ৭নম্বর ধারায়। এখানে ভারত ও বাংলা

ভাগের ক্ষেত্রে স্থানীয় আইনসভার সদস্যদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। এই ধারা অনুযায়ী ১৯৪৭-এর ২০ জুন বঙ্গীয় আইনসভায় দেশভাগ সংক্রান্ত মতামত জানবার জন্য ভোট হয়। মহঃ জিন্না এই ভোটের আগেই হুইপ জারি করে মুসলিম লীগ এবং তাদের সমর্থক এম. এল. এ. দের ভারত ভাগের পক্ষে ভোটদানের নির্দেশ দেওয়ার ফলে ২১৬ জন সদস্যের মধ্যে ১২৬ জন সদস্য ভোটে বঙ্গীয় আইনসভায় ভারতভাগের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেন। কিন্তু তখন অস্থায়ীভাবে বঙ্গীয় আইনসভা পূর্ববঙ্গ আইন সভা ও পশ্চিমবঙ্গ আইন সভা দুটি ভাগে ভাগ হয়ে যাওয়ায় এই দুটি আইনসভার সদস্যরা পৃথক পৃথকভাবে ভোট দানের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট আইনসভা ভারত ও পাকিস্তান কোন রাষ্ট্রের সঙ্গে তাদের সংযুক্তি চায় সে বিষয়ে তাদের রায় প্রদান করে। পশ্চিমবঙ্গ আইনসভা হিন্দু প্রধান হওয়ায় ৫৮-২১ ভোটে ভারতের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সংযুক্তিকরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ঐ ভোটের ফলাফল সম্পর্কে গভর্ণর এস বারোজ টেলিগ্রাম করে মাউন্টব্যাটেনকে জানান—

> Separate meetings of members went respect West repeat West Bengal Legislative Assembly this afternoon decided under paragraph six of H.M.G's statement by 58 votes to 21 votes that province Should be partitioned and under paragraph eight of the statement by 58 votes to 21 votes that West Bengal Should join existing Constituent Assembly (Document No. 278 of T.P Vol .XI, page-536)

কিন্তু পূর্ববঙ্গ আইনসভায় চিত্রটি বিপরীতধর্মী হয়। মুসলিম প্রধান পূর্ববঙ্গ আইনসভায় ভোট দানের মাধ্যমে পূর্ববঙ্গ পাকিস্তান রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত হল। পূর্ববঙ্গের আইনসভার ১০৬ জন সদস্য প্রত্যেকেই (৫ জন তফসিলী, ১০০জন মুসলমান এবং ১জন ভারতীয় খ্রিস্টান) ভোটদানের মাধ্যমে ভারতভাগের বিপক্ষে রায় দেয় এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রের সঙ্গে পূর্ববঙ্গের সংযুক্তিকরণের সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করে। মাউন্টব্যাটনের অন্যতম শর্ত ছিল বাংলার দুটি আইনসভার মধ্যে একটিতেও যদি অধিকাংশ এম. এল. এ বাংলা ভাগের পক্ষে মত দেন তবে বাংলা ভাগ করতে হবে। এই শর্ত অনুসারে দুটি আইনসভার ভোটাভুটির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা ভাগ অনিবার্য হল এবং পশ্চিমবঙ্গ ভারতবর্ষের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে এবং পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হল। ফলে দ্বিখণ্ডিত স্বাধীনতা পেল বাংলার মানুষ।

ইংরেজের বাংলা ভাগের এই পরিকল্পনা নতুন কিছু নয় ইতিপূর্বে শতাব্দীর সূচনা পর্বেও লর্ড কার্জন এমনই একটি কুটিল পরিকল্পনা (১৯০৫) করেছিলেন। সে ঘটনাই পরিণত রূপ পেল ১৯৪৭-এ। তবে তফাৎ এইটুকু শতাব্দীর শুরুতে সাধারণ মানুষ ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ফেটে পড়েছিলেন। সে প্রতিবাদে অস্ত্র ছিল বোমা আর বয়কট। কিন্তু ১৯৪৭-এর দেশভাগে বিপন্ন হল সাধারণ মানুষ অথচ তারা কোনো প্রতিবাদের ভাষা খুঁজে পেল না। নীরবতা আর চোখের জলকে সাক্ষী রেখে বিভাজন রেখা এঁকে দিয়ে গেলেন র‍্যাডক্লিফ। দেশটা ভাগ হয়ে গেল। মানুষগুলো নিজদেশে পরবাসী হয়ে গেল অথচ তারা জানতেও পারল না এ দেশটা আর তার নয়, সকালবেলা উঠে পাশের বাড়ির প্রিয় মানুষটাকে আর

খুঁজেও পেল না, হারিয়ে গেল মানুষগুলো, বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতিতে যুক্ত হল নতুন কয়েকটি শব্দ— উদ্বাস্তু, রিফুজি, ক্যাম্প। স্থানান্তরিত মানুষের স্বপ্নভঙ্গজাত শব্দ এগুলো। বস্তুত দেশভাগের সিদ্ধান্ত বাঙালি নেয়নি, এই সিদ্ধান্ত অখণ্ড ভারতবর্ষের অবাঙালি কেন্দ্রিয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দই নিয়েছিলেন পরোক্ষভাবে। তাদের নির্দেশেই বাঙালি মুসলিমরা অখণ্ড বাংলাদেশসহ পাকিস্তান রাষ্ট্রকে সমর্থন জানিয়েছেন। অন্যদিকে সেই কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পরোক্ষ হস্তক্ষেপে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিচার করে পশ্চিমবঙ্গের আইনসভা অখণ্ড বাংলা এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রের বদলে পশ্চিমবঙ্গের ভারত অন্তর্ভুক্তিকে সমর্থন করে। ফলে যে বাঙালির উঠোনের উপর দিয়ে, রান্নাঘরের কোল ঘেঁষে আন্তর্জাতিক সীমারেখা চিহ্নিত হল, যে বাঙালিরা সকালে উঠে শুনলেন তাদের দেশের নাম ভারতবর্ষ নয়, পাকিস্তান— তারা হয়ে গেলেন উদ্বাস্তু। তাঁদের ঠাঁই হল এ পার বাংলার শরণার্থী শিবিরে। পূর্ববঙ্গে সংখ্যালঘু হবার অপরাধে তারা তাঁদের পিতৃপুরুষের বসতভিটা, জমি-জমা, তুলসিতলা,দোলমঞ্চ-আবেগ ভালোবাসা শিকড় বাকড় ফেলে রেখে শুধু প্রাণটুকু হাতে নিয়ে যাত্রা করলেন অনির্দ্দেশ্যের পথে। ১৯৪৮ সালের মধ্যেই এ দেশে বাঙালি উদ্বাস্তুর সংখ্যা ২০,৪২,০০০ ছাড়িয়ে যায়। দেশ বিভাজনের প্রাক মুহূর্তে ভৌগোলিক বিভাজন নিয়ে যতটা ভাবা হয়েছিল, ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা সেখানে যতটা ক্রিয়াশীল ছিল বিভাজন উত্তরকালে বিধর্মী বা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের ভবিষ্যৎ কী হবে তা নিয়ে জাতীয় নেতৃত্ব ততটা চিন্তিত ছিলেন না। বলা যায় ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বে বা দেশভাগের আগে ধর্মীয় সংখ্যালঘু বিনিময় বিষয়টি আলোচনায় এলে উদ্বাস্তু সমস্যার জন্ম হ'ত না। উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের বিনিময় হলে উদ্বাস্তু সমস্যার তখনই হয়তো অনেকটাই সমাধান হয়ে যেত।

ভারত বা বাংলাভাগের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক মহলে যে দ্রুততা ছিল সে পরিমাণ বিভাগোত্তর কালে উদ্ভূত সম্ভাব্য সমস্যাবলী সম্পর্কে সে পরিমাণে সঠিক পরিকল্পনা তৈরি করবার চেষ্টা ছিল না। ফলে চল্লিশের দশকের দ্বিতীয়ার্ধের বাঙালি বিপন্নতার এক চরম মুহূর্তে পৌঁছেছিল। দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গার পর ৪৭-এর দ্বি-খণ্ডিত স্বাধীনতা বাঙালিকে এক অন্ধকারময় ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। সাধারণ অশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত নিম্নবিত্ত মানুষ তাদের নিয়ে এই রাজনৈতিক দাবার চাল কতখানি নিষ্ঠুর তা অনুভব করতে না পারলেও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত উচ্চবর্ণের হিন্দুরা অনুভব করেছিল আত্মমর্যাদা মান-সম্ভ্রম ও প্রাণ বাঁচাতে হলে উত্তর প্রজন্মকে সুরক্ষিত করতে হলে অতি দ্রুত দেশত্যাগ করাটা অত্যন্ত জরুরি। তাঁরা তাঁদের দূরদর্শিতা দিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন ইসলামিক রাষ্ট্র পাকিস্তান অমুসলিম মানুষেরা অদূর ভবিষ্যতে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে পরিণত হবে। নিরাপত্তাও তাদের থাকবে না। যদিও স্বাধীনতার অব্যবহিত আগে ১১ই আগস্ট জিন্না জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে ঘোষণা করেছিলেন—

আপনারা যেকোনো জাত ধর্ম বা বিশ্বাসের অনুগামী হতে পারেন— তার সঙ্গে রাষ্ট্রের কাজের কোনো সম্পর্ক নেই... আমরা এই মৌলিক নীতি থেকে আরম্ভ করছি যে আমরা

সবাই একটি রাষ্ট্রের নাগরিক, এবং সমান নাগরিক (Speeches and writings-M.A. Zinnah, কুণাল চট্টোপাধ্যায়, অনূদিত গ্রন্থ)। কিন্তু স্বাভাবিক নিয়মেই কথা রাখেননি জিন্না, কথা রাখেনি পাকিস্থানের লীগ সরকার। এই পূর্বাভাষ অনুভব করেই মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মানুষ ৪৭-এর আগে বা পরে পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করে চলে এসেছিল। পুরুষাণুক্রমে বসবাসকারী হিন্দুরা অনেকেই অবিশ্বাস করেন নি পুরুষানুক্রমে পাশাপাশি বসবাসকারী মুসলিমদের। যারা রয়ে গেলেন তারা প্রথম ধাক্কাটি খেলেন ১৯৪৮-এর আগস্টে। সামরিক অভিযানের মাধ্যমে মুসলিম নিজামকে সরিয়ে ভারত হায়দ্রাবাদকে দখল করে নিলে তার প্রতিক্রিয়ায় পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘু হিন্দুরা এদেশে চলে আসতে থাকে। এই উদ্বাস্তু প্রবাহ চরমে উঠল ১৯৫০-এ পূর্ববঙ্গে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরে। ১৯৫১-র আদমসুমারী অনুযায়ী এই শরণার্থীর সংখ্যা ২৩ লক্ষ ছাড়িয়ে যায়। অবস্থা আরো শোচনীয় হয়ে ওঠে ১৯৫২-তে পাকিস্তান ও ভারতে পাসপোর্ট ব্যবস্থা চালু করার পর। ওপার বাংলার সংখ্যালঘু হিন্দুরা এবারে বুঝতে পারল ভবিষ্যতে এই পাসপোর্টের কারণেই ইচ্ছে করলেও দেশত্যাগ তারা করতে পারবেন না। ফলে সরকারি নথি অনুযায়ী ১৯৫২-র এই পাসপোর্ট ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রতিক্রিয়ায় ১,২৭,০০০ মানুষ পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন। এই চলে আসার আরো একটি পরোক্ষ কারণ ছিল। তা হল জাতীয় নেতৃবৃন্দের এই শরণার্থীদের প্রতি মানবিক দায়বদ্ধতা। মহাত্মা গান্ধী এই উদ্বাস্তু সমস্যা তৈরি হতে পারে ভেবেই ১৯৪৭-এর ১৬ই জুলাই ঘোষণা করেছিলেন এই সব উদ্বাস্তুদের সাদরে গ্রহণ করা এবং তাদের সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা দেওয়া মানবিক কারণেই ভারতরাষ্ট্রের কর্তব্য। জওহরলাল নেহেরুও যে সেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১৯৫০-এর ৭ই আগস্ট লোকসভায় উল্লেখও করেছেন। জওহরলাল সেদিন বলেছিলেন—

> পূর্ববঙ্গে যারা বিপন্ন হবে, তাদের প্রতি আমাদের কর্তব্য হবে... আমাদের নিজেদের দেশেই তাদের আশ্রয় দেওয়া (হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থ 'উদ্বাস্তু' থেকে উদ্ধৃত)

এই রাষ্ট্রীয় প্রতিশ্রুতিতে ভরসা করে অসংখ্য মানুষ কখনো পায়ে হেঁটে, কখনো রেলপথে এমনকি জলপথেও এসে পৌঁছান ভারতের মাটিতে, তাঁদের উপযুক্ত পুনর্বাসনের কথা চিন্তা করে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে বনগাঁ এবং বার্নপুরে দুটি রিসেপশন সেন্টার খোলা হয়েছিল। এখান থেকে দেওয়া হত বর্ডার স্লিপ। সেখান থেকে তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হত বিভিন্ন আশ্রয় শিবিরে। ধুবুলিয়া, কুপার্সক্যাম্প, হাবড়া, বাইগাছি, গয়েশপুর প্রভৃতি জায়গায় আশ্রয় শিবির খোলা হয়েছিল। আশ্রয় শিবিরগুলির নানারকম চরিত্র ছিল। যে সমস্ত উদ্বাস্তু পরিবারে পুনর্বাসনের উপযোগী সমর্থ পুরুষ নেই বা যেখানে পরিবারের অভিভাবক অসমর্থ বা বৃদ্ধ তাদের জন্য তৈরি হয়েছিল Permanent Liability Camp P.L Camp। এই ক্যাম্পের শরণার্থীদের নিয়মিত রেশন দেওয়া হত। অন্যদিকে পরিবারের অভিভাবক মহিলা হলে বিশেষত বিধবা হলে তাদের সন্তানসহ টিটাগড়, রাণাঘাট, বাঁশবেড়িয়ায় মহিলা আশ্রয় শিবিরে থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ৫,৫৭, ৫৪৪৪ জনকে

বিভিন্ন আশ্রয় শিবিরে আশ্রয় দেওয়া হয়। এর মধ্যে খুব দ্রুত ৪,০৮,৫৫০ জন শরণার্থীকে স্থায়ী পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়। এই সব শিবিরে জায়গা না হলে সাময়িকভাবে তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হত ট্রানজিট ক্যাম্পে। কাশীপুর, উল্টোডাঙা ও ঘুঘুড়িতে ১২৫টি ট্রানজিট ক্যাম্প খোলা হয়েছিল। এখানেও যাদের জায়গা হল না তারা শিয়ালদহ স্টেশন বা অন্যত্র সাময়িক আশ্রয় নিয়ে পুনর্বাসনের জন্য অপেক্ষা করতেন। আশ্রয় শিবির থেকে শরণার্থী মানুষদের স্থায়ী পুনর্বাসনের ব্যবস্থাও করেছিল সরকার। উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দপ্তর গঠন করে পতিত ফাঁকা জমি সংগ্রহ করে কলোনী স্থাপনের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল সেদিনের সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত সরকার। অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ সরকারের অপেক্ষায় না থেকে নিজেরাই পতিত জমি জবর দখল করে কলোনি গড়ে তুলেছিল। বেলঘড়িয়ার যতীন দাস কলোনি, উত্তর ২৪ পরগনার হরিপদ বিশ্বাসের নেতৃত্বে নববারাকপুরের উপনিবেশ এভাবেই সেদিন গড়ে উঠেছিল। উদ্বাস্তু মানুষেরা শুধু যে পশ্চিমবঙ্গেরই নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিলেন তা নয়, প্রতিবেশী রাজ্য বিহার, উত্তরপ্রদেশ, উড়িষ্যা, ত্রিপুরা এমনকি সুদূর আন্দামানেও তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছিল সরকার।

শুধু পুনর্বাসনের ব্যবস্থাই সরকার করে নি। সরকার এইসব শরণার্থীদের জীবন ও জীবিকার কথাও ভেবেছে। আপদকালীন সমস্যা যেমন মিটেছে তেমনি ভবিষ্যতে এ দেশে তারা যাতে স্থায়ীভাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারে তার জন্য খোরাকি বাদেও চাষের জমি কেনার জন্য ৩০০ টাকা (১৯৫২-র আগে ১৫০ টাকা), অকৃষিজীবি মানুষের জন্য ৭৫০ টাকা (পূর্বে ৫০০ টাকা) ঋণের ব্যবস্থাও করেছিল। টিটাগড়ে শিল্প উৎপাদন কেন্দ্র তৈরি করে সেখানে উদ্বাস্তুদের তাঁবু, কার্পেট, শাড়ি, ধুতি উৎপাদনে কাজের সুযোগ করে দিয়েছে। নানারকম বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থাও করেছে। শুধু তাই নয় উদ্বাস্তুদের কর্মসংস্থানের জন্য Rehabilitation Finance Administration নামে একটি সংস্থা তৈরি করে ঋণ দেবার ব্যবস্থা করে শিল্প স্থাপনে শিল্পপতিদের উৎসাহিত করা হয়। এভাবে নতুন নতুন কাজের ক্ষেত্র তৈরি করে সেখানে উদ্বাস্তুদের নিয়োগের ব্যবস্থাও করে সরকার। সরকারের পাশাপাশি বেশ কিছু বেসরকারি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান বা ব্যবসায়ী সংস্থাও এই শরণার্থী মানুষের দিকে তাদের সাহায্যের হাত সেদিন বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

মানবিক দায়বদ্ধতা থেকেই রাজ্যসরকার বা কেন্দ্রীয় সরকার তাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তার মানে এই নয় সব ব্যবস্থাই নিখুঁত ছিল। শরণার্থীরা এসে সমস্ত সুযোগ সুবিধাই সকলে একইরকম পেয়েছিলেন। তাদের জীবনযাপন কোনো অসুবিধার মুখোমুখি হয়নি সেদিন। মনে রাখতে হবে সমস্যার অনুপাতে সমস্ত ব্যবস্থাটাই অপ্রতুল ছিল। জওহরলাল নেহেরুকে ১লা ডিসেম্বর ১৯৪৯-এ লেখা বিধানচন্দ্র রায়ের চিঠি থেকে জানা যায় এই সময় উদ্বাস্তু কল্যাণের বাবদ কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদান ছিল মাথা পিছু দুবছরে মাত্র ২০ টাকা। অর্থাৎ অত্যন্ত সামান্য। প্রায় ২৩ লক্ষ মানুষের জন্য দুবছরে কেন্দ্রীয় সাহায্য হল মাত্র ৩ কোটি টাকা। কাজেই রাজ্য সরকারের পক্ষে সমস্ত শরণার্থীদের জন্য উপযুক্ত বাসভূমি, খাদ্য, জীবিকার ব্যবস্থা করে ওঠা সম্ভব হয় নি। চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যের

অবস্থা ছিল আরো করুণ। কাজেই শুরু হল নতুন লড়াই। পূর্ব পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তু মানুষ যখন পালিয়ে এসেছিলেন তখন শুধু প্রাণটুকু বাঁচানোই লক্ষ ছিল। কিন্তু এ পার বাংলায় এসে প্রাণ যখন তার মৃত্যুভয় থেকে মুক্ত হল তখন শুরু হল আগামী প্রজন্মের জন্য উপযুক্ত বাসভূমি রচনা করার লড়াই। নতুন বসতি, নতুন কলোনি, নতুন উপনিবেশ যেমন তারা গড়ে তুলতে থাকলেন তেমন বেসরকারি উদ্যোগে নানা সমাজকল্যাণ পরিষদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যকেন্দ্রও প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। সামরিক তৎপরতায় নানা জায়গায় গড়ে উঠল নতুন নতুন উপনিবেশ। উদ্বাস্তু শিক্ষাবিদ আইনজীবী যথার্থ সমাজসেবক শিক্ষিত মানুষের জোট বাঁধলেন নানা জায়গায়। পূর্ববঙ্গে এক এলাকায় বসবাসকারী কিছু মানুষ পতিত জমি খুঁজে আকস্মিক তৎপরতায় জবর দখল করে নিয়ে বাঁশের খুঁটি, হোগলার বেড়া দিয়ে মাথা গোঁজার আশ্রয়টুকু তৈরি করে নিত। শুধু আশ্রয় নয় এক রাতে গড়ে উঠেছিল নেতাজী নগর বিদ্যামন্দির। উদ্বাস্তুদের সংগঠনশক্তি এবং কর্মদক্ষতা এতটাই শক্তিশালী ছিল যে মণিকুন্তলা সেনের মনে হয়েছিল এই কলোনিগুলি যেন হয়ে উঠেছিল এক একটি সংগ্রামের দুর্গ। পুলিশ ও জমির মালিকরা উৎখাত করতে এলেও পুরুষ ও রমণীর যৌথ প্রতিরোধী ভূমিকায় তারা হার মেনেছিল উদ্বাস্তুদের সংগ্রামী ঐক্যের কাছে।

নতুন উপনিবেশে পূর্ববঙ্গীয় জীবনের সামাজিক বিন্যাস ও শৃঙ্খলা ভেঙে গেল। বদলে গেল মূল্যবোধ সংস্কৃতি, জীবনকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গী। পূর্ববঙ্গীয় জাতগত অহংকার আর থাকল না। রিফুজি ক্যাম্পে স্টেশনের প্লাটফর্মে খোলা আকাশের নীচে মানুষগুলো এক ও অভিন্ন হয়ে গেল। প্রেম, ভালোবাসা, শরীরী উত্তাপ দিয়ে তারা ভেঙে ফেলল যুগযুগজনিত বর্ণব্যবস্থা। উচ্চবর্ণের হিন্দু এখানে এসে মুদির দোকান দিল, কাঁচা মালের ব্যবসা খুলে বসল। চায়ের দোকানে বয়ের কাজ নিল ওপার বাংলার কৃতী ছাত্র। পুরুতের কাজ ছেড়ে ঘরামির কাজ শুরু করল একদা সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ। মেয়েরা গেল মাস্টারি বা আয়ার কাজে। উপার্জনের তাগিদে মেয়েরা গণ্ডির বাইরে বেরিয়ে এল। এই সংস্কার ভাঙার পদক্ষেপ ফেলে শুধু উদ্বাস্তু মেয়েরাই ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসেছিলেন তা নয়, পশ্চিমবঙ্গের স্থানীয় মহিলামহলকেও তা প্রভাবিত করেছিল। এ সম্পর্কে এক গবেষক লিখেছেন—

> In the struggle for existence and thrown into the Job of breadwinners, the Bengal refugee women helpd to alter the whole socio-economic seenario of west Bengal.

অর্থাৎ এই উদ্বাস্তু মেয়েরাই সেদিন পথ দেখিয়েছিল সমস্ত পশ্চিমবঙ্গবাসীকে, বলা যায় ঘর হারিয়েই তারা পথের মূল্য বুঝেছিল। মেয়েদের আব্রু-ইজ্জত নিয়ে ততটা দুশ্চিন্তা আর রইল না। বহু-দিনের জড়তা ভেঙে ফেলে শরণার্থী মানুষ এক নতুন জীবন সাধনায় মগ্ন হন। এ জীবনে পৌঁছে তাঁদের জীবন থেকে মুছে যেতে থাকে যৌথ জীবনের ধারণা। একান্নবর্তী পরিবারগুলো ভেঙে যেতে থাকে। বস্তিজীবন, বাসাবাড়ি বা ভাড়াবাড়ির জীবনে অভ্যস্ত হতে থাকে মানুষ। বারো ঘর এক উঠোনে বড় হয়ে উঠতে থাকে নতুন প্রজন্ম।

বাঙালির জাতীয় জীবনের ইতিহাসে এতবড় বিপর্যয় কোনোদিন ঘটে নি। বলা যায় ইতিহাসের সবচেয়ে বড়ো মাইগ্রেশান ঘটেছে ১৯৪৬-৪৭ সালে এবং তার পরবর্তী দশকে এই ভারতভাগের ফলে। 'Never before or since, in human history, there has been a mass exdus of people. ফলে গোটা যুগটাই যেন হয়ে উঠেছে Age of Migration. দীর্ঘদিনের অভিমানের ফলশ্রুতি এই মাইগ্রেশান। আসলে পূর্ববঙ্গে মুসলমানরা সংখ্যাগুরু হলেও শিক্ষায়-দীক্ষায়, ক্ষমতায়, প্রশাসনিক স্তরে সর্বত্রই সংখ্যালঘু হিন্দুরাই মুসলিম জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। এর ফলে ক্ষমতা পাবার আকাঙ্ক্ষা জেগেছে। কিন্তু হিন্দুর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠবে না বলেই সংখ্যাগুরু হয়েও হিন্দুর বশ্যতা মেনে নিয়েছে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে থেকে গেছে এই অভিমান। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'খোয়াবনামা' উপন্যাসে ডাক্তার আমিরুদ্দিন আখন্দর বলেছিল—

> মোসলমানগুলো হিন্দু জমিদারের প্রজা। হিন্দু উকিলের মক্কেল, হিন্দু মহাজনের খাতক, হিন্দু মাস্টারের স্টুডেন্ট, হিন্দু ডাক্তারের পেশেন্ট।

অর্থাৎ ক্ষমতার অলিন্দে রয়েছে সংখ্যালঘু হিন্দু। এবং তা শিক্ষিত মোসলমানেরা লক্ষ করতে শুরু করেছেন। সাংস্কৃতিক জগতে দুই সম্প্রদায়ের মিলন ঘটাবার চেষ্টা চৈতন্য থেকে লালন সাঁইরা করে গেলেও দুই সম্প্রদায়ের মিলন কোনোদিনই ঘটল না বরং অভিমানবশত সাংস্কৃতিক দূরত্ব ক্রমে বেড়ে গেল। 'খোয়াবনামা' উপন্যাসে কাদের তাই আলাদা দেশ আলাদা রাষ্ট্র দাবি করে কম্পাউন্ডার প্রশান্তকে বলেছে—

> জাতপাত নিয়েই থাকেন। আলাদা জাত বলেই, তো আলাদা হতে চাই। আলাদা দেশ দিতে আপনাদের এত গায়ে লাগে কেন?

আন্তর্জাতিক সীমারেখা রাজনৈতিক মানচিত্রকে বদলে দিয়েছিল কিন্তু তারও আগে বাঙালির হৃদয় জুড়ে ফুটে উঠছিল একটি বিভাজনরেখা— সে রেখার কথা তেমনভাবে কোনো ঐতিহাসিক লিখে উঠতে পারলেন না। অসম্প্রদায়িক হতে গিয়ে তারা অলক্ষে হয়ে উঠতে লাগলেন দূরতম অর্থে সাম্প্রদায়িক ভাবনার প্রসূতিভবন। অন্যদিকে যে বোবা কান্না, উদাসীন দৃষ্টি নিয়ে পথে নামলেন সাধারণ মানুষ তাঁদের কথাও কি যথাযথভাবে ফুটে উঠল সমাজতত্ত্ববিদের গবেষণায় বা সামাজিক দর্পণ সাহিত্যে, বিশেষত উপন্যাসে। প্রশ্ন তুলেছেন প্রখ্যাত গবেষক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর মতে 'দেশবিভাগের মতো বিদারক আলোড়ক সুদূর পরিণামী ঘটনা লেখকদের যেন তেমন করে আকর্ষণ করতে পারে নি। (দেশভাগ ঃ বাংলা কথাসাহিত্যের দর্পণে) হাসান আজিজুল হকও প্রায় একই কথা উচ্চারণ করেন—

> আমার দুঃখ থেকেই বোঝা যায় যে দেশবিভাগকে বিষয় করে যে মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি হতে পারত, তা আর হলো না।... দেশ বিভাগের পরে যে চূড়ান্ত ও হৃদয়বিদারক মানববিপর্যয় ঘটেছে তা নিয়ে কোনো ঔপন্যাসিকই লিখলেন না।

কিন্তু কেন? বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ঔপন্যাসিকেরা এতবড় বিপর্যয়ের মুখেও তাঁদের সক্ষমতার সহৃদয় প্রকাশে কুণ্ঠিত থাকলেন? এই একই কুণ্ঠা আমরা ইতিপূর্বে ঘটে যাওয়া

মন্বন্তরের (১৯৪৩) সময়েও দেখেছিলাম। দুটি ঘটনাই প্রত্যক্ষ করেছিলেন বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়রা। অথচ দু-একটি বাদে (অশনিসঙ্কেত) খুব উঁচুমানের মহাকাব্যিক উপন্যাস তাঁরা কেউই লিখে উঠতে পারেননি। এমনটি দেশভাগের ক্ষেত্রেও আমরা লক্ষ্য করলাম। আসলে ঘটনার আকস্মিকতায় ও বিপর্যয়ের মুখোমুখি নিরুপায় অসহায়তায় নির্বাক স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন মন্বন্তর সমকালের লেখকেরা। সেই বিপর্যয়ের রেশ মেলাতে না মেলাতেই দেশভাগ এসে ভেঙেচুরে দিয়ে গেল জীবনযাপনের যাবতীয় বিন্যাস, সুখ-আনন্দ। নিদারুণ ঘটনার বারংবার পুনরাবৃত্তিতে নির্বাক হয়ে গিয়েছিলেন সেদিনের লেখক সমাজ। তাছাড়া লেখকেরা ছিলেন পশ্চিমবঙ্গীয়। তাই বাহিত খবর ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাবজনিত কারণেও হয়তো তাদের মানসিক সংলগ্নতার অপ্রতুলতা ঘটেছিল। তাই সে সময়ের অগ্রজ লেখকেরা ছিন্নমূল মানুষের বেদনা হয়তো ততটা অনুভব করেন নি। অথবা ঘটনার নির্মমতা, নিষ্ঠুরতা, হৃদয়হীনতা তাদেরকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল। এমনটি ভাবার অন্যতম কারণ হল সে সময় সাধারণ সমস্যা কণ্টকিত মানুষও কি পেরেছিলেন সোচ্চারে কথা বলতে। আকস্মিক বিপর্যয়ে মানুষ যেমন বাক্যহারা হয়ে যায় তেমনি কি ঘটেনি সেদিন। হয়তো তাই। এই নীরবতা, এই বোবা কান্না সেদিন বাস্তুহারা অসহায় মানুষের রুদ্ধসঙ্গীতে পরিণতি পেয়েছিল। একে কেউ কেউ একধরনের জাতীয় ট্রমা বলে মনে করেছেন। কিন্তু কেন এই ট্রমা? এত স্তব্ধতা এত নৈশঃব্দ? এই প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গে সেদিন যারা নৈঃশব্দের তর্জনীর সামনে অসহায়ভাবে রুদ্ধবাক হয়ে পড়েছিলেন, তাদের প্রতি একটি অভিযোগের আঙুল উঠে আসে। কিন্তু মনে রাখতে হবে এই ট্রমা, এই সাইলেন্স বানানো নয়, পরিস্থিতিজাত। তা নির্বাক আত্মকথন। তাই এ সময়ের অধিকাংশ লেখার মধ্যেই একটি নিরুচ্চার কথা বা বোবা কান্না পাঠকের মনে মনে সঞ্চারিত হয়ে যায়। ছিন্নমূল হবার মুহূর্তে কবি শঙ্খ ঘোষ আমাদের শোনান সে কথা—

> প্রণাম তোমায়, শেষ। প্রণাম তোমায়, এই দ্বাদশীর বিকেল। প্রণাম, ওই খালের মুখে নদীর জলের ঢেউ। প্রণাম তোমায় তুলসীতলা, মঠ, প্রণাম ফুলমামী। প্রণাম তবে প্রণাম তোমায় সুপুরিবনের সারি (সুপুরিবনের সারি)

ছিন্নমূল হবার মুহূর্তে মানুষের এই বোবা কান্না আমরা শুনতে পাই সবিতা রায়চৌধুরীর গল্পেও—

> রমলার দুচোখে তখন জলের ধারা, হাত কাঁপে, গলা ধরে আসে, তবু গৃহদেবতার পট থেকে রামুর পড়ার বই— যা পায় হাতের কাছে গুছিয়ে নেয়। আর ছেঁড়াকাপড় জড়ানো জীর্ণ মায়ের ফটোটাকে বুকে তুলে নেয়। ...তারপর একসময় শরণার্থী বোঝাই ট্রেনে শিয়ালদহ স্টেশনে এসে দাঁড়ায়। (হরিহর পণ্ডিতের গল্প, দ্বিতীয় ছোঁয়া)

এই ভাঙা বুক আর বোবা কান্নাকে গোপনে রেখে উদ্বাস্তু বাঙালি গড়ে তুলল নতুন উপনিবেশ। এও এক নতুন ইহুদির গল্প। যাদবপুর, বাঘা যতীন, অশোকনগর, নববারাকপুর, নেতাজীনগর— নানা প্রান্তে গড়ে উঠল নতুন নতুন বাসভূমি। প্রথমে হোগলা, পরে টালি

টিনের চালের ঘর, আরো পরে একটা দুটো পাকা ঘর, আরো পরে সুরম্য অট্টালিকা। উদ্বাস্তু বাঙালি ক্রমে স্বচ্ছল, মধ্যবিত্ত বা অভিজাত বাঙালি হয়ে উঠল। পারস্পরিক কথপোকথনের শুরুতে আর কেউ জিজ্ঞাসা করে না তার আত্মপরিচয়— 'দ্যাশ ছিল কোথায়'? ভেতরে ভেতরে এই অভিজাত মানুষগুলো আজও উদ্বাস্তু। আজও তাদের চেতনায়-অবচেতনায় ছড়িয়ে রয়েছে—

আমার মুখে অন্তহীন আত্মলাঞ্ছনার ক্ষত
আমার বুকে পালানোর পালানোর আরো পালানোর
দেশজোড়া স্মৃতি

(দেশহীন/ শঙ্খ ঘোষ)

তথ্যঋণ :

১। ক্ষমতা হস্তান্তর ও দেশ বিভাগ — লাডলীমোহন রায়চৌধুরী
২। কেন উদ্বাস্তু হতে হল — শ্রীদেবজ্যোতি রায়।
৩। দ্বিজাতিতত্ত্ব ও বাঙালি — বিনয়ভূষণ ঘোষ।
৪। India Wins Freedom : Moulana Abdul Kalam Azad.
৫। Speches and writings : M.A. Zinnah.
৬। The Marginal Men : Prafulla Kumar Chakraborty.
৭। উদ্বাস্তু — হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়
৮। ভাঙা বাংলা ও বাংলা সাহিত্য — অশ্রুকুমার সিকদার
৯। বাংলা উপন্যাসে উদ্বাস্তু জীবন — তাপস ভট্টাচার্য
১০। বিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি — স্বপন বসু ও হর্ষ দত্ত সম্পাদিত
১১। দেশভাগ স্মৃতি আর স্তব্ধতা — সেমন্তী ঘোষ সম্পাদিত
১২। দেশভাগের প্রেক্ষাপটে গান্ধী-জিন্না পত্রালাপ — ভাষান্তর অর্জুন গোস্বামী।
১৩। ১৯৪৭ : স্মৃতি-বিস্মৃতি — কৃষ্ণা বসু।
১৪। সাতচল্লিশ থেকে সত্তর এবং আগে পরে : ভারতজ্যোতি রায়চৌধুরী।
১৫। খোয়াবনামা — আখতারুজ্জামান ইলিয়াস।
১৬। সুপুরিবনের সারি — শঙ্খ ঘোষ।
১৭। এখন প্রদোষকাল — সবিতা রায়চৌধুরী।
১৮। কবিতা সংগ্রহ — দিনেশ দাশ।
১৯। কবিতা সংগ্রহ — শঙ্খ ঘোষ।
২০। 'বিতর্কিকা' : প্রসঙ্গ দেশভাগ, অক্টোবর, ২০১৩।
২১। 'উজাগর', ১৩ বর্ষ, ১৪২৩।
২২। 'তথ্যসূত্র', ২২ বর্ষ, ২০১৭।